প্রাগৈতিহাসিক : অকৃত্রিম এক জীবনের উৎস সন্ধান

মালবিকা মণ্ডল

দেশ-কাল সাহিত্য অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধযুক্ত। বহুবিধ ঘটনার উত্তাল ভীড়ে কেটেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলেবেলা। ১৯১৩-১৪-তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৩৭-তে রুশ বিপ্লব, ১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলন, সর্বোপরি এই সময়ে ফ্রয়েডের তত্ত্ব ব্যাখ্যা ও প্রচার—সব মিলিয়ে কবি সাহিত্যিকদের মানসিক জগতে এক বিশাল বিপর্যয়।

"বিশ বা ত্রিশের দশকের লেখকদের কৈশোর বা প্রথম যৌবন কেটেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে। সেই যুগের অর্থনৈতিক সংকট ও প্রত্যয়ভঙ্গের বেদনার আঘাতে তাদের যৌবন স্বপ্ন বিহ্বল, ক্লান্ত আবার তারি মধ্যে নতুন আদর্শ ও আশায় উজ্জীবিত যুবচিত্ত সংগ্রাম ও বিদ্রোহের জন্যও যেন প্রস্তুত। এই কিশোর দল যখন যুবক হয়েছেন, যখন সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন তখন তাদের সেই বিক্ষত যৌবনের যন্ত্রণা, বিদ্রোহ, স্বপ্ন সবই সাহিত্যে রূপলাভ করেছে। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে কল্লোল পর্ব যৌবনের বিচিত্র সুরে অনুরণিত।"

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি মধ্যেই রয়েছে বিশ/ত্রিশের দশকের লেখকদের মানসিক অস্থিরতার পরিচয়। প্রেম, সত্য, সুন্দরের পূজারী রবীন্দ্রনাথের উপর নেমে এসেছিল আঘাত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পটভূমিতে। "সমস্ত দিক একটা নাড়া দেওয়ার উদ্যোগ" নিয়ে জন্ম হল কল্লোগোষ্ঠীর যারা কালিকলম (১৯২৬), কল্লোল (১৯২৩), প্রগতি (১৯২৭) পত্রিকাকে আশ্রয় করে তাদের রবীন্দ্রবিরোধিতাকে হতাশা ও নৈরাশ্যে প্রকাশ করলেন।

কল্লোল ও কল্লোলোত্তর গোষ্ঠীর চিন্তা চেতনা বিক্ষুব্ধ পটভূমিতেই এসেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আঠাশ বছরের সাহিত্য জীবনের আয়ুষ্কালে দুটি গোষ্ঠীর সঙ্গেই তার পরিচিতি ও স্থিতি।

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু তাঁকে কল্লোল গোষ্ঠীর কুলবর্বন, 'of Kallol in spirit' বলে দাবী করলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তব জীবনদৃষ্টি সচেতন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা সমকালীন লেখকদের তুলনায় অদ্ভুত স্বাতন্ত্র্যে মহীয়ান করেছে। কল্লোল গোষ্ঠীর রবীন্দ্রবিরোধিতা মানিকের সাহিত্যে কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। কল্লোল সম্পর্কিত ধারণা "সাহিত্য করার আগে" প্রবন্ধে পরিষ্কার উচ্চারণে জানিয়েছেন—

(১) সাহিত্যে ওই 'আধুনিক মার্কা ধারাটা এসেছিল প্রচণ্ড সোরগোল তুলে। প্রায় একটা বিপ্লবমার্কা বিদ্রোহের রূপ নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে সাহিত্যের অন্যান্য দিকপালেরা সচকিত হয়ে উঠেছিলেন তারুণ্যের এই বলগাহীন সাহিত্যিক অভিযানে, বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল।

(২) "খ্যাতানামা কবি সাহিত্যিক মানেই জনসাধারণ সমগ্র বা আংশিকভাবে, স্থায়ীভাবে অথবা সাময়িকভাবে যাকে তারিফ করছে। এদের ভূমিসাৎ করে কাব্য সাহিত্যের মোড় ঘুরানো যায় না।"

(৩) 'সাহিত্যের চলতি সংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত তারুণ্যের বিক্ষোভ বিপ্লব এনে দিতে পারে না।"

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিগুলি নিশ্চয় যথেষ্ট তার অবস্থান, চিন্তা ও মানসিকতা অনুধাবনের জন্য। তাই দ্বিধাহীন ভাবে মানিক ছিলেন এ সবের উর্ধ্বে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। জীবনের দৈন্যতা, রিক্ততার মধ্যে জীবনসত্য অন্বেষণে উন্মুখ লেখক মানসে ভীড় করেছে সাধারণ মানুষ, প্রতিদিনের জীবনচর্যা থেকে তুলে আনা অসহায়, ক্লিষ্ট, প্রবৃত্তিতাড়িত মানুষ। মনের গহন গভীরে ডুব দিয়ে অন্তস্থলকে আবিষ্কারের চেষ্টা মানিককে করেছে চরম আধুনিক বাস্তববাদী অনন্য এক লেখক।

অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে লেখকের জীবনদর্শন। শিল্প বিচারের প্রাক্‌কালে প্রয়োজন শিল্পীর চিন্তা চেতনা অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিতি। লেখকের আবেগধর্মী মন নিচের স্তরের মানুষের বলিষ্ঠ প্রেম, সহজ সুস্পষ্ট যৌনচেতনাকে তাদের মতন করে রূপায়িত করতে পারেনি। তাই মানিকের অন্বেষণও থেকেছে অতৃপ্ত। এই বাস্তবতার অন্বেষণেই সংবেদনশীল বাস্তববাদী লেখক মানিক জীবন বিশেষজ্ঞের ভূমিকায় অবতীর্ণ। নির্মোহ অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেলে অন্বেষণ করেছেন মানুষের অবচেতন মনের গহন গভীর সর্পিল জগতকে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের গল্পের বেশ কিছুটা অংশ জুড়ে রয়েছে মানুষের মনের জটিল পথপরিক্রমা যার পরিচয় মেলে "প্রাগৈতিহাসিক", "আততায়ী", 'সরীসৃপ' প্রভৃতি গল্প। মনস্তত্ত্ব নিয়ে বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে পরীক্ষার ফলশ্রুতি এই গল্পগুলি।

জটিল মানসিক জগতে পরিক্রমা, রোমান্টিক ভাববিলাসের অবসান, ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রভাব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের গল্পের সচেতন বৈশিষ্ট্য। নানাবিধ ঘটনার আঘাতে অস্থির সমাজজীবনকে সাহিত্যে রূপায়িত করার দায় অস্বীকার করতে পারেন না যুগসচেতন শিল্পী।

"লক্ষ্যভ্রষ্ট, আদর্শচ্যুত, সাধারণ মধ্যবিত্তের মধ্যে ভয়াবহ আর্থিক সংকট, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দুঃসহ অত্যাচারে দেখা দিয়েছিল বিচ্ছিন্নতা, যৌনবিকৃতি এবং বিকারগ্রস্ততা"— কথাসাহিত্যে মানিক ঃ সরোজমোহন মিত্র

এই দায়বদ্ধতা, সমাজসচেতনতা, ঔপনিবেশিক ভারতবাসীর হতাশা, অসহায় মানুষের বেঁচে থাকার দুর্মর লড়াই এর কাহিনী রয়েছে প্রথম দিকের গল্পগুলিতে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বে রচিত প্রাগৈতিহাসিক গল্পটি। (প্রাগৈতিহাসিক গল্প সংকলনের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৩৭ সালের ১৭ এপ্রিল প্রথম প্রকাশিত হয়)

সর্বাধিক অনূদিত, আলোচিত ও বিতর্কিত এই গল্পটি নিঃসন্দেহে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির আনুকূল্যে প্রাপ্ত গ্রন্থপরিচয় থেকে জানা যায়—

"প্রধানতঃ ইংরেজিভাষায় লেখকের সর্বাধিক অনূদিত গল্প প্রাগৈতিহাসিক"

দুর্ধর্ষ ডাকাত ভিখুর ঘটনাবহুল জীবনের পরিসমাপ্তিতে গল্পের শুরু। নূতন করে বেঁচে ওঠার অভূতপূর্ব প্রয়াসের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিক্রিয়া সব কিছু মিলিয়ে একটি নিটোল plot এর আস্বাদন দেয়।

গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্র ভিখু তাকে কেন্দ্র করেই সমগ্র কাহিনী আবৃত হয়েছে। কিন্তু তারও অদৃশ্য নিয়ামক মানুষের আদিম জৈব প্রবৃত্তি—প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই যার অবাধ সঞ্চরণ। সমগ্র কাহিনীবৃত্ত সেই অদৃশ্য নিয়ামকের অঙ্গুলি সঙ্কেতে আবর্তিত হয়েছে ভিখু যার মাধ্যম মাত্র।

ভিখুর জীবনবৃত্তান্ত সরলরৈখিক গতিতে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। ভিখু চরিত্রের পরিস্ফুটনের কাজেই গল্পকারের প্রয়োজন মতো এসেছে পারিপার্শ্বিক চরিত্রগুলি—পাঁচী, বসির, পেহ্লাদ, ভরত। কোন পার্শ্বিক চরিত্রের অনাবশ্যক জটিলতা গল্পটিকে কোথাও ভারবাহী করেনি কিংবা কোন বাড়তি ঘটনার অনাবশ্যক বাহুল্যে ভিখুর জীবনবৃত্ত পরিক্রমায় কোন বাধা পড়েনি। বিজ্ঞানমনস্ক লেখকের বলিষ্ঠ লেখনীতে প্রাগৈতিহাসিক গল্পটি দৃঢ় পিনদ্ধ গঠনে একটি সার্থক ছোটগল্প।

অতীতের স্মৃতিচারণার পথ ধরে আমাদের সামনে এসেছে ভিখুর অতীত জীবন। গল্পের পরিসমাপ্তিতে বিজয়গর্বে ভিখু ভিখারিণী পাঁচিকে পিঠে নিয়ে, জ্যোৎস্নালোকিত পথে হেঁটে চলেছে। এই অপূর্ব পরিসমাপ্তি যেমন পাঠককে ভিখুর জীবনের সদর্থক এক পরিসমাপ্তিতে এনে পৌঁছায় তেমনি এক অতৃপ্ত কৌতূহল জাগিয়ে রেখে গল্পটি শেষ হয়ে যায়। শেষ ছত্রকটিতে মানবজীবনের অন্তর্লীন আদিম প্রবৃত্তি সম্পর্কিত মন্তব্য পাঠককে একটা বোধের সামনে এনে উপস্থিত করে। বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্যটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। "গল্পটির শেষ অংশ যেখানে হত্যাকারী দুবৃত্ত খোঁড়া ভিখিরি মেয়েটাকে কাঁধে নিয়ে অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে সেটি আমার অবিস্মরণীয় মনে হয়। তার সব গল্পের সমাপ্তি এতটা সম্পূর্ণভাবে তৃপ্তিকর নয়।"

পেটের ক্ষুধা আর দেহের ক্ষুধার যুগল সম্মিলনে ভিখু আদিম মানুষের এক আশ্চর্য প্রতিচ্ছবি। অন্ধকার জগতের মানুষ তার অন্ধকারতম প্রবৃত্তি, আকাঙ্ক্ষা, জিঘাংসা নিয়ে সশরীরে হাজির গল্পের আসরে।

বসন্তপুরে বৈকুণ্ঠ সাহার গদিতে ডাকাতি করতে গিয়ে বল্লমের খোঁচা খেয়েও পালিয়ে আসতে পারে। প্রাণের ভয়ে দশমাইল দৌড়ে শরবনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে আবার রাত্রির অন্ধকারে নয় ক্রোশ দৌড়ে সাঙাত পেহ্লাদের চিতলপুরের বাড়িতে পৌঁছে যায়। পেহ্লাদ ভিখুকে আশ্রয় দিতে ভয় পায়। গ্রাম থেকে মাইল পাঁচেক দূর জঙ্গলে ঘন ঝোপের নীচে মাচা বেঁধে ভিখুর থাকার ব্যবস্থা করে। কিছুটা চিঁড়ে গুড় আর জল দিয়ে কদিন পরে আসার আশ্বাস দিয়ে চলে আসে প্রহ্লাদ।

আহত ভিখু কয়েকটা দিন যে দুর্বিসহ যন্ত্রণা, ভয়ংকর নির্জন পরিবেশ, পিঁপড়ে জোঁকের আক্রমণ, মাথার উপরে ঝুলন্ত সাপ নিয়ে যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে থাকে তা যে কোন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে অসম্ভব। অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে লড়াই করে সে শুধু থাকেনা, বেঁচে থাকে। দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তিই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। "মরিবেনা, সে কিছুতেই মরিবে না। বনের পশু যে অবস্থায় বাঁচে না সেই অবস্থায় মানুষ সে বাঁচিবেই।"

এরপরের গল্প মরণাপন্ন ভিখুর বেঁচে ওঠার গল্প। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পেহ্লাদ ও তার

বোনাই ভরত তাকে উদ্ধার করে আনে ও মাচার উপর খড় বিছিয়ে তার থাকার ব্যবস্থা করে। ধীরে ধীরে বিনা পরিচর্যাতেই সুস্থ হয়ে ওঠে ভিখু। তারপর একদিন প্রহ্লাদের অনুপস্থিতির সুযোগে তার স্ত্রীর হাত চেপে ধরে। ফলতঃ, প্রহ্লাদ ও ভরতের হাতে মার খেয়ে তাকে সেই আশ্রয় ছাড়া হতে হয়েছে। কিন্তু মানুষের ধর্মানুযায়ী যে কৃতজ্ঞতা প্রহ্লাদের প্রাপ্য ছিল তাতো সে পেলই না উপরন্তু রাত্রির অন্ধকারে তার ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে ভিখু নিজের অচরিতার্থ জৈবপ্রবৃত্তিকে প্রশমিত করে।

এরপরে শুরু হয় ভিখুর জীবনের পরবর্তী পর্যায়। জেলে ডিঙি চুরি করে তাতে চেপে অচৈতন্য অবসন্ন ক্ষুধার্ত ভিখু মহকুমা শহরে পৌঁছায়। কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় সে তখন মরীয়া। নদীর জলে গায়ের রক্ত ধুয়ে শহরে প্রবেশ করে। "বাজারের রাস্তায় প্রথম যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হইল তাহারই সামনে হাত পাতিয়া সে বলিল, 'দুটো পয়সা দিবান কর্তা"

শুরু হল ভিখুর ভিখারী জীবন। জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া যার জীবনের পেশা ছিল সে আজ একটা হাতের অভাবে লোকের কাছে হাত পেতে জীবিকা নির্বাহ শুরু করল। পরিবর্তিত পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করেছে এই পরিবর্তিত জীবিকা মেনে নিতে। ভিখুর আক্ষেপ "বাঁটি লইয়া ডানটিরে যদি রেহাই দিতা ভগমান"

ক্রমশঃ নতুন জীবিকায় অভ্যস্ত হয়ে যায়, রোজগার বাড়ে, পেটভরে খাবার সংস্থান হয়। বিনু মাঝির পাশের চালাটি মাসিক আট আনায় ভাড়া নেয়। ধীরে ধীরে শরীরে শক্তি আসে। কিন্তু পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তির একটা উপায়, একটা স্থিতাবস্থা এসে গেলে দৈহিক ক্ষুধা, দেহজ কামনার লেলিহান শিখা তাকে পাগল করে তোলে, "পৃথিবীর সব নারী সব খাদ্য যদি সে একাই ভোগ করতে পারত"।

বিনু মাঝির সুখী দাম্পত্য জীবন তার গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। তাদের ঘরে আগুন দিয়ে তাদের সুখী দাম্পত্য জীবনকে, পারিবারিক শান্তিকে পুড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে। শেষ পর্যন্ত দৃষ্টি পড়ে পায়ে 'তৈলাক্ত ঘা' নিয়ে ভিক্ষারতা যুবতী ভিখারিণী পাঁচার দিকে। শয্যাসঙ্গিনীর অভাবে বিনিদ্র নিরুপায় ভিখু শেষ পর্যন্ত পাঁচীকে প্রস্তাব দেয় পায়ের ঘা সারিয়ে তার সঙ্গিনী হতে। কিন্তু পাঁচীও তার ভিখারিণী জীবনের মূলধন 'ঘা'টিকে সারাতে চায় না। পাঁচির প্রত্যাখ্যান আগুন জ্বালিয়ে দেয় ভিখুর সর্বাঙ্গে। যেমন করেই হোক পাঁচির দেহের অধিকার তার চাই-ই। নারীসঙ্গবিহীন জীবন প্রতিবন্ধী ভিক্ষুক ভিখু আর সহ্য করতে পারে না। গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিখুর যে পরিচয় আমরা পেয়েছি তাতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, দৈহিক পরিতৃপ্তির মধ্যেই-তার জীবনের আনন্দ, বেঁচে থাকার মানে খুঁজে পাওয়া। শেষে প্রবৃত্তিতাড়িত ভিখু একদিন গভীর রাত্রে ঘুমন্ত বসিরকে তীক্ষ্ণ লোহার শিক বিদ্ধ করে হত্যা করে, পাঁচির সহায়তায় বসিরের সঞ্চিত অর্থ নিয়ে পাঁচিকে সঙ্গে নিয়ে বিজয়ী ভিখু জীবনের নূতনতর পথে যাত্রা করে। গল্পের পরিসমাপ্তি এখানেই।

গল্পে ভিখুকে মাধ্যম করে মানুষের আদিম প্রবৃত্তির আবরণ উন্মোচন করেছেন লেখক। বিশেষকে অবলম্বন করে সামান্যে, সার্বজনীন সত্যে পৌঁছে গেছেন তিনি অনায়াস দক্ষতায়।

কেন্দ্রীয় চরিত্র ভিখু। তার অন্ধকার জটিল পথ পরিক্রমা এই গল্পের উপজীব্য বিষয়। প্রচণ্ড শারীরিক ক্ষমতা, তীব্র গতিবেগ সম্পন্ন ভিখুর সঙ্গে পরিচয় ঘটে গল্পে অতীত চারিতায় ও প্রথম কয়েকটা লাইনে। তারপরের ইতিহাস ভিখুর ক্ষমতা হ্রাসের ইতিহাস। কিন্তু মনের গহন কোণে লুকিয়ে থাকে যে প্রবৃত্তি তার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেনি। যে জৈব প্রবৃত্তিবশে 'বাসির ঘরে উন্মত্ত রাত্রিযাপন' করত, শ্রীপতি বিশ্বাসের বোনটাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, রাখুর বউকে নিয়ে পালিয়ে গেছিল হাতিয়ায়, সেই জৈবপ্রবৃত্তির বশেই পায়ে তৈলাক্ত ঘা থাকা সত্ত্বেও পাঁচিকে সঙ্গিণী করতে চেয়েছে কিংবা আশ্রয়দাতা প্রহ্লাদের স্ত্রীর দিকে কামনার হাত বাড়িয়েছে।

এই প্রবৃত্তির শৃঙ্খল সারা গল্প শরীরে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিখুর আচরণে। তাই প্রাগৈতিহাসিক জৈব প্রবৃত্তিকে গল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দু বললে অত্যুক্তি হয় না।

ভিখু জৈবপ্রবৃত্তিতাড়িত একটি মানুষ। দৈহিক ক্ষুধা নিবৃত্তির মধ্য দিয়েই সে জীবনের আনন্দ খুঁজে পায়। পুকুরঘাটে স্নানরতা যুবতীর কাছে ভিক্ষা চাওয়া কিংবা বসিরের সঙ্গিনীকে অধিকার করার মধ্যেও তার জৈবতা পরিস্ফুট।

বিন্নু মাঝির ভাড়াটে হওয়ার সুবাদে তার সাংসারিক জীবন, দাম্পত্য প্রেম, পারস্পরিক নির্ভরতা তাকে আকৃষ্ট করেনা বরং বিন্নুর স্ত্রীকে দেখে তার হিংসা হয়, কোন এক অজানা প্রতিশোধের জন্য হাত নিসপিস করে, কিন্তু মানসিক কোন ক্ষুধার তাড়না তার নেই। চাহিদা নেই, শুধুই আছে জৈবিক ক্ষুধা। একেবারেই বলিষ্ঠ, প্রকাশ্য তার চাহিদার অভিব্যক্তি। কোন ভদ্রজনোচিত মুখোশ নেই, রোমান্টিক আবেগ তন্ময়তা নেই।

'পেহ্লাদে'র নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে সে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেছে কিন্তু ডানহাতটা শুকিয়ে যাওয়ায় পুরোনো জীবিকায় আর ফিরতে পারেনি। তবুও সেই জীবনের নৃশংসতা, মাদকতা ভিখুকে আজও টানে। "গভীর রাত্রে গৃহস্থের বাড়ি চড়াও হইয়া সকলকে মারিয়া কাটিয়া টাকা ও গহনা লুটিয়া রাতারাতি উধাও হইয়া যাইত। স্ত্রীর চোখের সামনে স্বামীকে বাঁধিয়া মারিলে তাহার মুখে যে অবর্ণনীয় ভাব দেখা দিত, পুত্রের অঙ্গ হইতে ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিলে মা যেমন করিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিত, মশালের আলোয় সে দৃশ্য দেখা আর সেই আর্তনাদ শোনার চেয়ে উন্মাদকর নেশা জগতে আর কী আছে?"

কিন্তু নিরুপায় ভিখু শারীরিক ভাবে পঙ্গু-হওয়ায় নতুন নেশা খোঁজে। মানুষের স্বভাবজ সে প্রেম, দয়া, ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা এসবের লেশমাত্র তার চরিত্রে নেই। যে 'পেহ্লাদের জন্য সে প্রাণে বাঁচল, লোভের আগ্রাসী ক্ষুধা তারই স্ত্রীর দিকে হাত বাড়াল। অচরিতার্থ কামনার আগুনকে প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে উপকারী বন্ধু প্রহ্লাদের ঘরে আগুন দিল। তার মধ্যে কোন নীতিবোধ কাজ করেনা, নেই কোন পাপপুণ্যের বিচার যা আছে তা শুধুই দেহজ কামনা পরিতৃপ্তির মাধ্যম সন্ধান। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের আদিমতা, জৈবিক প্রবৃত্তি তার চরিত্রে, আচরণে, সক্রিয়তায়। দৈহিক যৌনকামনা ও অপরাধ প্রবণতার মিশ্রণে ভিখু চরিত্র সৃষ্টি করে মানিক সাহিত্য জগতে এক নূতনমাত্রা যুক্ত করলেন।

অপরদিকে জীবনের প্রতি অপার মমত্ববোধ কাজ করেছে ভিখুর মধ্যে। সে বেঁচে

থাকতে চায়। সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে আপাত দৈহিক ক্ষুধা পরিতৃপ্তির মধ্যে জীবনে বেঁচে থাকার তাগিদ অনুভব করে। পরিবর্তিত জীবনে নূতন পরিস্থিতিতে নিজের সামর্থ্য অনুসারে বেঁচে থাকার দুর্দমনীয় লড়াই। বিজ্ঞানীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে লেখক মানুষের অন্তস্থল পর্যন্ত দেখেছেন—তার কামনা, বাসনা প্রতিহিংসা সব শুদ্ধ হাজির করেছেন সাহিত্যের বাসরে।

ভিখুর পাশাপাশি আরও যে সব পার্শ্বচরিত্র গল্পে স্থান পেয়েছে তার মধ্যে 'পাঁচী' অন্যতম। আদিম মানব ভিখুর যোগ্য সঙ্গিনী 'পাঁচী'। ভিখারিণী পাঁচী বর্ণনাটিতে তাই দেহের বাঁধুনির কথাটি উল্লেখযোগ্য। "বয়স তাহার বেশী নয়, দেহের বাঁধুনিও বেশ আছে। কিন্তু একটা পায়ে হাঁটুর নীচে হইতে পায়ের পাতা পর্যন্ত তাহার থকথকে তৈলাক্ত ঘা"

এই 'ঘা'-টিই তার মূলধন। তার জোরেই সে অন্যদের চাইতে বেশী রোজগার করে। বিশেষ যত্নে তাই ঘাটিকে সারতে দেয় না। জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে সে অত্যন্ত সচেতন। সুখে থাকার কোন প্রলোভনেই সে তার মূলধন হারাতে রাজী নয়। জীবন তাকে অভিজ্ঞ করেছে। অন্ধকারময় জীবনে প্রেম, কামনা যে ভিন্নতর অর্থ বহন করে সে তার অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছে। সে জানে ভিখুর এই আসক্তি দুদিনের, তারপর তাকে আবার নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। তাই অভিজ্ঞ 'পাঁচী' বলে "দুদিন বাদে মোরে যখন তুই খেদাইয়া দিবি, ঘাটি মুই তখন পামু কোয়ানে?"

ভিখুর আজীবন একনিষ্ঠ থাকার প্রতিশ্রুতি যে কতটা হাস্যকর, মেকী তা সে জানে ফলে সে পার্শ্ববর্তী আর এক খঞ্জ ভিখারি বসিরের সঙ্গে থাকতে শুরু করেছে। ভিখুর নেশাও ক্রমশ 'তালের রসের' মতো জমাট বাঁধে। প্রেম? নাকি কামের উত্তাপে তার ঘৃণা 'উবে' যায়। "নিজেকে সে আর সামলাইয়া রাখিতে পারেনা" তাই আবার পাঁচির দারস্থ হয় কিন্তু ততদিনে সে আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে বসিরের কাছে।

অবশেষে কামনাতাড়িত ভিখু আদিম মানুষের মতোই-বসিরকে নৃশংসভাবে হত্যা করে পাঁচিকে অধিকার করে। পাঁচীর চরিত্রের মধ্যেও সেই পাশব প্রবৃত্তি। জান্তব অনুশাসনই তারও জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাই বসির হত্যা তার মনে কোন দুঃখ, প্রিয় জন হারানোর ব্যথা জাগায় নি। ভয় পেয়েছিল সে নিজের প্রাণের। পরমুহূর্তেই বসিরের সংগৃহীত অর্থ নিয়ে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে "ভিখুর হাত ধরে" নতুন জীবনের দিকে যাত্রা করে। যে আদিমতা, জৈব প্রবৃত্তি ভিখুকে নিয়ন্ত্রণ করে, পাচির জীবনের নিয়ন্ত্রণের রাশও তারই হাতে।

গল্পের পাত্রপাত্রীদের মুখের ভাষা একেবারেই অকৃত্রিম। ভাষাশুদ্ধ জীবনটাকে সরাসরি গল্পের আসরে হাজির করেছেন লেখক। পাঁচী, ভিখু তাদের অন্ধকার জীবনের ভাষায় প্রেম করে ঝগড়া করে। বসিরকে হত্যার পর ভিখুর হুমকি "ঠ্যারাইন বোবা ক্যান গো? আরে কথা ক হাড়হাবাইতা মাইয়া! তোরেও দিমু নাকি সাবার কইরা—অ্যাঁ?"

যে মুহূর্তে পাঁচী ভিখুর অর্জিত সম্পত্তির পর্যায়ভুক্ত হয়েছে ভিখুর ভাষাও পরিবর্তিত হয়েছে। বসিরকে হত্যার পর তার আচরণ ও ভাষা অন্ধকার জগতের ভাষাকেই আমাদের সামনে উপস্থিত করে।

লেখকের বিবৃতির ভাষা সাধুভাষা কিন্তু চরিত্রগুলি গ্রাম্য চলিত ভাষায় কথা বলে। (১) পেহ্লাদ—"ঘাওখান সহজ লয় স্যাঙাত। উটি পাকবো। গা ফুলবো"

(২) ভিখারিনি বলে—"আগে আইবার পার নাই? যা এখন মর গিয়া, আখার তলের ছালি খা গিয়া"

কিংবা

বসির বলিল—"ফের উয়ার সাথে বাতচিত করলি জানে মাইরা দিমু, আল্লার কিরে।"

কঠিন 'রূঢ়' ভাষায় চরম পর্যবেক্ষকের মতো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের মনের গতিপ্রকৃতির কথা আমাদের জানিয়েছেন। মনে হয় যেন লেখকের গবেষণাগারে চরিত্রগুলি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার ফলশ্রুতি এই চরিত্রগুলি।

'ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্তস্তব্ধতা'—দুবার ব্যবহৃত হয়েছে। যখন ভিখু কামনা তাড়িত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী বসিরকে হত্যা করে যৌনসঙ্গিনী পাঁচীর দখল নিতে চলেছে তখন ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্তস্তব্ধতা আবার যখন পাঁচীকে অর্জন করে প্রবৃত্তিতাড়িত আদম ইভকে পিঠে করে তার দেহের ভারে ঝুঁকে ঝুঁকে চলেছে নতুন করে বাঁচার আশায় তখনও "ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা"

জীবনের সুস্থ কলোরোলের বাইরে অপরাধ জগতের মানুষের সক্রিয়তা, ভিখু ও পাঁচির জীবনের পালা বদল, সঙ্গীবদলও ঘটে গেলে নিঃশব্দে, জীবনের কল্লোলের বাইরে স্তব্ধ পৃথিবীতে।

অর্মাজিত চলিত ভাষার প্রয়োগে পাঁচী, বসির-ভিখু জীবন্ত চরিত্র হিসাবে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। লোভ কামনা সহ পূর্ণাঙ্গ একটি মানুষ যার আচরণে কোথাও ভদ্রতার মুখোস নেই,—যার অন্বেষণে শিল্পী মানিকের পদচারণা সেই মানুষকে পূর্ণ রূপে যৌন কামনা সহ তুলে আনলেন সাহিত্যে। প্রখ্যাত সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন—"ইঙ্গিত গূঢ় ভাষা, অসাধারণ সংযম, এক একটি উদ্ধৃতিযোগ্য পংক্তিতে এক একটি অভিনব সত্যের বিদ্যুদ্বিকাশ—ছোটগল্পের সফলতম আঙ্গিক রূপে নির্দিষ্ট হতে পারে।"

ভাষাকে মসৃণ করার কোনো প্রয়াস নেই। একেবারে জীবন্ত ছবি এঁকে চলেন—"পিঁপড়াগুলি টিপিয়া মারিল"—ভিখু চরিত্রের নৃশংসতার দ্যোতক। "জোঁকেরা তাহার রক্ত শুষিয়াশুষিয়া কচি পটলের মতো ফুলিয়া উঠিয়া আপনা হইতেই নীচে খসিয়া পড়িয়া যায়"—একটি অস্বস্তিকর ঘৃণ্য অনুভূতির সচেতন প্রকাশ।

ইংরাজী অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় অতুলচন্দ্র গুপ্ত মন্তব্য করছেন "Manik Bandopadhyay wrote in a direct unornamental style"

যে পরিবেশ, সে জীবনকে বাস্তবভঙ্গীটুকু পর্যন্ত তুলে ধরার প্রয়াসে কলম ধরেছেন লেখক সেখানে 'Ornamental style' চলে না।

প্রাগৈতিহাসিক গল্পটির নামকরণটি ইঙ্গিতময়। আদিম সুস্পষ্ট প্রবৃত্তি সম্পন্ন মানুষ ভিখু এই কাহিনীর বৃত্তকেন্দ্রে। আদিম প্রবৃত্তি তাড়িত একটি মানুষ। ভিখু, পাঁচী, বসিরের নিয়ন্ত্রণের রাশ আদিম জৈব প্রবৃত্তির হাতে। সারা গল্পাঙ্গন জুড়ে নায়কের চলা ফেরা, কথাবলা,

চিন্তাভাবনা সবই মানুষের অন্তর্নিহিত আদিম জীবনস্বভাব অনুসারী। এই আদিম প্রবৃত্তি প্রাগৈতিহাসিক এবং প্রতিটি মানুষের মনে অন্তরশায়িত। তারই উন্মুক্ত রূপ কোন ছদ্ম মুখোস ছাড়াই ভিখুর মধ্যে প্রকাশিত। শেষ কয়েকটি লাইনে লেখকের ইঙ্গিতে চরম ব্যঞ্জনার প্রকাশ—

"যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু এ পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনদিন পাইবেও না!"

অদ্ভুত ব্যঞ্জনাময় তাৎপর্যপূর্ণ এই ভাষা ব্যবহারে গল্পটির চরমোৎকর্ষ। লেখক বিশেষকে অবলম্বন করে জীবনের সার্বজনীন সত্যে উপনীত হয়েছেন। এখানেই গল্পটির চরম সার্থকতা ও শিল্পসফলতা।

তথ্যনির্দেশ

১. লেখকের কথা—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
২. সাহিত্যে ছোটগল্প—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
৩. বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ—বীরেন্দ্র দত্ত
৪. একালের ছোটগল্প—ডঃ সরোজমোহন মিত্র
৫. বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার—ভূদেব চৌধুরী